بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ মোতাবেক ৩১ ইখা, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বর্তমানে তাবুকের যুদ্ধের আলোচনা চলছে। মহানবী (সা.) এই যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ইতিহাস থেকে আমরা আরো জানতে পারি, ইসলামী বাহিনীর তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার পর মহানবী (সা.) প্রথম যাত্রাবিরতি দেন **যু-খুশুব** নামক স্থানে। **যু-খুশুব** মদীনা থেকে এক রাত সফরের দূরত্বে সিরিয়ার পথে একটি উপত্যকা, যা ঝরনাবহুল একটি স্থান। সেখান থেকে মহানবী (সা.) যোহর ও আসরের নামায জমা করে আদায় করা শুরু করেন। এই সফরের সময় তিনি (সা.) যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা নিয়মিতভাবে জমা করে আদায় করতে থাকেন। সফরকালে যেসব স্থানে তিনি (সা.) যাত্রাবিরতি করেছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। সেগুলোর মধ্যে কিছু স্থানের শুধুমাত্র নাম পাওয়া যায়। সেগুলোও পরে যদি সুযোগ হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ্ বর্ণনা করা হবে। হযরত মু'আয বিন জাবাল বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাবুকের যুদ্ধে ছিলেন; তাঁর যাত্রা শুরু করার পূর্বেই সূর্য ঢলে গিয়েছিল। তিনি যোহর ও আসর জমা করেন। আর সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে তিনি রওয়ানা হলে যোহরে বিলম্ব করতেন যতক্ষণ না আসরের সময় হতো। আর মাগরিবের ক্ষেত্রেও এরূপই করতেন; তাঁর রওয়ানা হবার পূর্বে সূর্য অস্ত গেলে মাগরিব ও ইশা জমা করতেন, আর যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই তিনি রওয়ানা হতেন তবে মাগরিব বিলম্বে পড়তেন যতক্ষণ না এশার সময় হয়ে যাত্রাবিরতি করতেন, অতঃপর উভয় নামায জমা করতেন।

বর্ণিত হয়েছে, এই সফরে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ ইমামতির সৌভাগ্য লাভ করেন। সেই ঘটনাটি এরূপ: হযরত মুগীরা বিন শু'বা বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ফজরের নামাযের পূর্বেই বাইরে গমন করেন। আমি তাঁর পেছনে পানির মশক নিয়ে বের হই, অর্থাৎ পানি নিয়ে যাই। যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) ফিরে আসেন আমি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন আমি মশক থেকে তাঁর হাতে পানি ঢালতে থাকি এবং তিনি নিজের উভয় হাত তিনবার ধৌত করেন। [এখানে সফরে কীভাবে তিনি ওযু করেছিলেন তার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।] অতঃপর তিনি (সা.) তাঁর বরকতময় মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তারপর তিনি তাঁর বাহুদ্বয় নিজের জুব্বা থেকে বের করতে যান, কিন্তু জুব্বার হাতাগুলো সরু ছিল তাই তিনি তাঁর হাত জুব্বার ভিতর ঢুকিয়ে বাহু জুব্বা থেকে বের করে কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। অতঃপর তিনি তাঁর মোজার ওপর মাসাহ করেন; অর্থাৎ সে সময় মোজা পরিহিত ছিলেন, তাই মোজার ওপর মাসাহ করে সেগুলো পরিষ্কার করেন। অতঃপর সামনে এগিয়ে যান। মুগীরা বলেন, আমিও তাঁর সাথে সামনে এগিয়ে যাই; গিয়ে আমরা দেখি, তারা হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফকে সামনে এগিয়ে দিয়েছেন, তিনি তাদের নামায পড়াচ্ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) দুই রাকআতের মধ্যে এক রাকআত পান; অর্থাৎ এক রাকআত তারা আগেই পড়ে ফেলেছিল এবং তিনি (সা.) দ্বিতীয় রাকআত লোকদের সাথে আদায় করেন।

যখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ সালাম ফেরান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের নামায শেষ করার জন্য দাঁড়ান তখন এই বিষয়টি মুসলমানদের বিচলিত করে এবং তাদের বেশিরভাগ তাসবীহ্ পাঠ করতে থাকে। মহানবী (সা.) নিজের নামায শেষ করে লোকজনের দিকে মনোযোগী হন এবং বলেন, তোমরা ঠিক কাজ করেছ অথবা বলেন, ভালো করেছ। অর্থাৎ তিনি (সা.) নামায যথাসময়ে আদায় করার কারণে তাদের প্রশংসা করেন।

সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করার বর্ণনাও পাওয়া যায়। হযরত ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাবুকের যুদ্ধের যাত্রাপথে হিজরে অবস্থানকালে তাদের নির্দেশ দেন, তারা যেন এর কূপ থেকে পানি পান না করে এবং অন্যদেরকেও যেন পান না করায়। সাহাবীগণ বলেন, আমরা তো এর পানি দিয়ে আটা মেখে ফেলেছি এবং আমরা আমাদের পশুদের পানি পান করিয়েছি। তিনি (সা.) তাদেরকে মাখানো আটা ফেলে দেবার আর যে পানি তাদের কাছে মজুদ করা হয়েছিল তা মাটিতে ঢেলে দেবার নির্দেশ দেন। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) খাবার ফেলে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং হযরত আবু যার বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, যারা এই পানি দিয়ে আটা মেখেছে, অর্থাৎ এই স্থান থেকে নেওয়া পানি দিয়ে মাখানো আটা ফেলে দেবার নির্দেশ দেন যে, এটা ফেলে দাও। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন, এই কূপের পানি পানও করবে না এবং তা দিয়ে ওযুও করবে না, বরং এর পানি দিয়ে যে আটা তোমরা মেখেছ তা উটদের খাওয়াও, নিজেরা তা কখনো খেয়ো না।

অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দেশ দেন, তারা যেন সেই কূপ থেকে পানি নেয় যেখানে হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রী পানি পান করতে আসত, অন্য কূপ থেকে নয়। বুখারীর ভাষ্যকার ইবনে হাজার আসকালানীর মতে তিনি (সা.) এই কূপ, অর্থাৎ হযরত সালেহর উষ্ট্রীর কূপের জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে, যখন মহানবী (সা.) হিজর অতিক্রম করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, সেসব লোকের জনপদে প্রবেশ কোরো না যারা অন্যায় করেছে, কেবল এই শর্তে যে, তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ অত্যন্ত ভীতি ও বিনয়ের অবস্থা বিরাজমান থাকা উচিত; যেসব জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র শাস্তি বর্ষিত হয়েছিল তাদের জনপদ পরম ভীতির সাথে অতিক্রম করা উচিত, পাছে তোমাদের ওপরও সেই বিপদ আপতিত হয় যা তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল। অতঃপর তিনি (সা.) নিজের চাদর দিয়ে নিজের পবিত্র মুখমণ্ডল ঢেকে নেন আর তখন তিনি বাহনে আরোহিত ছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, তিনি (সা.) নিজের মাথা ঢেকে নেন এবং গতি বাড়িয়ে দেন, যতক্ষণ না উপত্যকা অতিক্রম করে যান। হিজর নামক এলাকার পরিচয় হলো, মদীনা থেকে তাবুক যাবার পথে এই এলাকা আসে। সেখানে হযরত সালেহর জাতি 'সামুদ' বসবাস করত। এই এলাকার নাম ছিল হিজর। বর্তমানে এই এলাকা 'মাদায়েনে সালেহ' নামে প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'লা এই জাতিকে অসংখ্য নিয়ামতে ধন্য করেছিলেন। সবুজ-শ্যামল ক্ষেতখামার ছিল, প্রবহমান ঝরনা ছিল, কৃষিকাজের ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল, খেজুর ও অন্যান্য ফলের বাগান ছিল, অতুলনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার অধিকারী ছিল এই লোকেরা। তাদের অপার সম্ভাবনা ছিল; তারা পরিশ্রমী ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের প্রাচুর্য দান করেছিলেন, এমনকি তাদের দক্ষতা এমন ছিল যে, তারা পাহাড়ে ঘর নির্মাণ করত। হযরত সালেহর উষ্ট্রী তাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ ছিল, কিন্তু তারা এর পায়ের রগ কেটে দিয়েছিল। এজন্য আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেন।

পবিত্র কুরআনে এই জাতির নাম আসহাবুল হিজর উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআন শরীফে আল-হিজর নামের সূরাও রয়েছে।

এই সফরে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর উষ্ট্রী হারিয়ে যাবার ঘটনাও পাওয়া যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যখন মহানবী (সা.) তাবুক অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক স্থানে তাঁর (সা.) উষ্ট্রী কাসওয়া হারিয়ে যায়। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তা খুঁজতে বের হন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট হযরত উম্মারা বিন হাযমও ছিলেন, যিনি আকাবার বয়আতে অংশ নিয়েছিলেন এবং বদরী সাহাবী ছিলেন। হযরত উম্মারার তাঁবুতে যায়েদ বিন সালত ছিল, যে ইহুদী গোত্র বনু কায়নুকার সদস্য ছিল এবং ইহুদী ছিল; পরে মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু মুসলমান এমনই ছিল যে, সে কপটতা প্রকাশ করেছিল, অর্থাৎ ঈমান পূর্ণরূপে দৃঢ় ছিল না। তাই এখানেও এভাবে এর প্রকাশ ঘটেছে যে, হযরত উম্মারা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন তখন যায়েদ তাঁবুর লোকদের বলে, মুহাম্মদ (সা.) কি এই দাবি করেন না যে, তিনি নবী এবং তিনি তোমাদেরকে ঊর্ধ্বলোকের সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন? কিন্তু অবস্থা হলো, তিনি নিজেই জানেন না– তাঁর উষ্ট্রী কোথায় গেছে! যায়েদ নিজের তাঁবুতে এই কথা বলছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উম্মারাকে বলেন; অর্থাৎ যখন তিনি তাঁর (সা.) নিকট উপস্থিত ছিলেন তখন বলেন, এক ব্যক্তি এই কথা বলেছে যে, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের বলে, সে নবী; এবং সে তোমাদেরকে ঊর্ধ্বলোকের সংবাদ অবহিত করছে বলে মনে করে। অথচ সে নিজেই জানে না, তার উষ্ট্রী কোথায় আছে! তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে বিষয়ের জ্ঞান দান করেন আমি তা ছাড়া আর কিছুই জানি না। অর্থাৎ অদৃশ্যের জ্ঞান তো আমি রাখি না। আল্লাহ্ তা'লা যা বলেন আমি তা-ই বলি। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে উষ্ট্রী সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন, তা অমুক উপত্যকায় আছে; আর তিনি একটি উপত্যকার দিকে ইঙ্গিত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এই মুনাফিকের কথা শুনে তৎক্ষণাৎ আত্মাভিমান প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে (সা.) কাশফের মাধ্যমে জানিয়েও দেন যে, ওখানে অমুক স্থানে সেটি আছে, অথবা ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন। [তিনি (সা.) বলেন,] এর লাগাম একটি গাছের সাথে আটকে আছে। সুতরাং যাও এবং সেটিকে আমার কাছে নিয়ে আসো। তখন সাহাবীরা যান এবং সেটিকে নিয়ে আসেন। অতঃপর হযরত উম্মারা নিজের তাঁবুর দিকে যান এবং বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আজ একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। এইমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের এক ব্যক্তির কথা সম্পর্কে জানিয়েছেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) অবহিত করেছিলেন। হযরত উম্মারার তাঁবুর মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জানায়, আল্লাহ্‌র শপথ! যে কথা সম্পর্কে আপনি এইমাত্র বললেন যে, আল্লাহ্ তা'লা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জানিয়েছেন, যায়েদ আপনার আসার পূর্বে ঠিক এই কথাই বলেছিল; অর্থাৎ যে ব্যক্তি বসে আছে সে ঠিক এ কথাই বলেছে। এতে হযরত উম্মারা যায়েদের ঘাড় ধরে তার সঙ্গীদের বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! আমার তাঁবুতে একটি সাপ ছিল এবং আমি তাকে আমার তাঁবু থেকে বের করার বিষয়ে উদাসীন ছিলাম। আর যায়েদকে সম্বোধন করে বলেন, ভবিষ্যতে আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। কিছু লোকের ধারণা হলো, যায়েদ পরবর্তীতে তওবা করেছেন; আর কারো কারো ধারণা হলো, সে এভাবেই দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল এবং এই অবস্থাতেই মারা যায়। এক রেওয়ায়েতে আছে, যে সাহাবী তাঁর (সা.) নির্দেশিত স্থান থেকে উষ্ট্রী খুঁজে এনেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত হারেস বিন খাযামা।

এই সফরে পাথেয় অর্থাৎ পানাহার সামগ্রীরও ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরে লোকেরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যদি আপনি আমাদের অনুমতি দেন তাহলে আমরা আমাদের পানি বহনকারী উট জবাই করে নিই এবং আমরা তা খাই ও এর চর্বি ব্যবহার করি। তিনি (সা.) বলেন, করো, কেননা ক্ষুধায় বেশ খারাপ অবস্থা। বর্ণনাকারী বলেন, এতে হযরত উমর (রা.) আসেন। অর্থাৎ তাকে যখন জানানো হয় তখন তিনি আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যদি আপনি এরূপ করেন তাহলে বাহন সংখ্যা কমে যাবে। হ্যাঁ, লোকদের কাছে রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট রসদ নিয়ে আসার নির্দেশ দিন এবং তারপর তাদের জন্য তাতে বরকতের দোয়া করুন। হতে পারে, আল্লাহ্ তা'লা তাতে বরকত দান করবেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা.) একটি চামড়ার দস্তরখান আনিয়ে তা বিছিয়ে দেন আর এরপর সবার কাছে রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট রসদ অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রী আনান। কেউ মুঠোভর্তি ভুট্টা আনল, কেউ মুঠোভর্তি খেজুর, কেউ রুটির টুকরা প্রভৃতি নিয়ে আসল। এভাবে সেই দস্তরখানে কিছুটা খাদ্যদ্রব্য জমা হলো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেটির ওপর বরকতের দোয়া করেন। অতঃপর বলেন, তোমরা তোমাদের পাত্রে এখান থেকে তুলে নাও। তারা সেখান থেকে তাদের পাত্রে খাদ্য তুলে নেয়। এমনকি সৈন্যদের কোনো পাত্র পূর্ণ হতে বাকী থাকল না। অতঃপর সবাই আহার করল এবং পরিতৃপ্ত হলো আর কিছু খাদ্য উদ্‌বৃত্তও রয়ে গেল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রসূল। আর যে-ব্যক্তি কোনো সংশয়-সন্দেহ না রেখে এ দুটি সাক্ষ্য নিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

এই সফরে বিভিন্ন ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। দুই ব্যক্তির লড়াইয়ের একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে অংশ নেই। আমার এক চাকর ছিল। সে এক ব্যক্তির সাথে লড়াই করে এবং তাদের দুইজনের মধ্যে একজন আরেকজনের হাতে কামড় দেয়। তিনি (রা.) বলেন, যার হাতে কামড় দেওয়া হয় সে তার হাত কামড়দাতার মুখ থেকে টেনে বের করতে গেলে তার সামনের দুটি দাঁতের মধ্য থেকে একটি দাঁত উপড়ে বেরিয়ে আসে। এত জোরে কামড়ে ধরেছিল যে বের হচ্ছিল না; জোরে টান দেবার ফলে যে কামড় দিয়েছিল আর যার মুখে হাত ছিল– তার দাঁত পড়ে যায়। যাহোক, তারা দুইজন মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে। যার দাঁত ভেঙে গিয়েছিল সে ক্ষতিপূরণ দাবী করে বলে, এ ব্যক্তি আমার দাঁত ফেলে দিয়েছে, এজন্য আমাকে এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। তখন মহানবী (সা.) এ অভিযোগ নাকচ করে দেন। তিনি (সা.) বলেন, এটি অন্যায়। অর্থাৎ তাকে ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী বলেন নি। তিনি (সা.) বলেন, সে কি চিবিয়ে ফেলার জন্য তার হাত তোমার মুখে রেখে দেবে? যেন সেটি উটের মুখ, যা চিবিয়ে অভ্যস্ত। [অর্থাৎ যার হাত কামড়ানো হচ্ছিল সে যখন আত্মরক্ষার্থে নিজের হাত টান দেয়, তখন অপর ব্যক্তির দাঁত ভেঙে যায়। এজন্য এক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য হয় নি।] সুতরাং ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্তও প্রকৃত পরিস্থিতি ও অবস্থাভেদে হয়ে থাকে। প্রকৃত ঘটনা যাচাই না করে অবাস্তব কোনো রক্তপণ আদায় করা হয় না।

অনুরূপভাবে এই সফরের আরো কিছু ঘটনাও রয়েছে। যেমন হযরত হুমাইদ সাঈদী বর্ণনা করেন, তাবুকের যুদ্ধে সফরকালে তিনি (সা.) যখন কুরা উপত্যকায় পৌঁছেন, সেখানে খেজুরের একটি বাগান ছিল। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের বলেন, অনুমান করো– কী

পরিমাণ খেজুর হতে পারে! তখন সবাই অনুমান করে আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ও দশ ওয়াসাক অর্থাৎ প্রায় আঠারোশ কিলোগ্রাম বলে অনুমান করলেন। অর্থাৎ এ পরিমাণ খেজুর সেখান থেকে পাওয়া যাবে। আর সেই বাগানের মালিক ছিল এক নারী, যে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি (সা.) তাকে বলেন, যখন তুমি সেই বাগানের ফল পাড়বে তখন ওজন স্মরণ রেখো– কতটা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তাবুক থেকে ফেরার পথে যখন আমরা সেই বাগানের কাছে পৌঁছুলাম তখন সেই নারীকে জিজ্ঞেস করা হলো, কী পরিমাণ ফল পাওয়া গিয়েছিল? তখন সে ঠিক ঐ পরিমাণই বলে যতটা মহানবী (সা.) অনুমান করেছিলেন, অর্থাৎ দশ ওয়াসাক। অনুরূপভাবে এই বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন তাবুকে আসি তখন তিনি (সা.) বলেন, সতর্ক থেকো! আজ রাতে তীব্র ঝড় হবে। কোনো ব্যক্তি যেন দাঁড়িয়ে না থাকে। আর যার সাথে উট রয়েছে সে যেন উটের হাঁটুও বেঁধে নেয়। আর যদি কাউকে প্রয়োজনে বাইরে যেতে হয়, সে যেন একা না যায়, বরং দুইজন মিলে যায়। বুঝা যাচ্ছে, মহানবী (সা.) তীব্র ঝড়ের আভাস পেয়েছিলেন। কিংবা হতে পারে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এ ব্যাপারে অবগত করেছিলেন। সাহাবীগণ বর্ণনা করেন, আদেশ পালনার্থে আমরা আমাদের উটগুলো বেঁধে ফেলি। অতঃপর সেই রাতে তীব্র ঝড় হয়। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল যাকে সেই ঝড় উড়িয়ে তাঈ গোত্রের পাহাড়ে নিয়ে ফেলে। আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, বনু সায়েদার দুই ব্যক্তি এই আদেশ পালন করে নি। একজন একাকী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হয়। আরেকজন তার উট খুঁজতে একা একা বের হয়ে যায়। যে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিল, সে খানাক রোগে আক্রান্ত হয় যা মূলতঃ গলদেশের এক ধরনের ব্যাধি। আর যে উটের খোঁজে বের হয়েছিল তাকে প্রচণ্ড ঝড় উড়িয়ে তাঈ গোত্রের দুই পাহাড়ের মাঝখানে নিয়ে নিক্ষেপ করে। মহানবী (সা.) যখন এ বিষয়ে জানতে পারেন তখন বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সাথি ছাড়া একা কাউকে বাইরে বের হতে নিষেধ করি নি? তাদের মাঝে যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তার জন্য মহানবী (সা.) দোয়া করেন, ফলে সে সুস্থ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে (ঝড়) তাঈ গোত্রের পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে পরবর্তীতে তাঈ গোত্রের লোকেরা মদীনায় তাঁর (সা.) নিকট পৌঁছে দেয়।

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, ধূলিঝড়ের পর সকালে যখন লোকেরা জাগ্রত হয় তখন তাদের কাছে পানি ছিল না। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে আবেদন করলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) দোয়া করেন যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা একখণ্ড মেঘ প্রেরণ করেন যা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হয় আর তারা নিজেদের মশক (পানির পাত্র) পূর্ণ করে নেন এবং নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দোয়ার ফলে তাবুক সফরে নিদর্শনস্বরূপ বৃষ্টি বর্ষিত হবার আরেকটি ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে বলা হয়, আপনি আমাদেরকে তাবুকের যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু বলুন। তিনি (রা.) বলেন, আমরা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে তাবুকের দিকে যাত্রা করেছিলাম। আমরা এক স্থানে শিবির স্থাপন করি। সেখানে আমরা এতটা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ি যে, আমাদের অনুভব হচ্ছিল যেন আমাদের গলা ফেটে যাবে। এমনকি পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যে, কেউ পানির সন্ধানে গিয়ে যদি ফিরে না আসত তাহলে আমরা মনে করতাম, হয়ত সে মারা গেছে। কেউ কেউ উট জবাই করে এর পাকস্থলি থেকে পানি বের করে তা পান করত আর অবশিষ্ট অংশ নিজের পেটে সংরক্ষিত রেখে দিত। [পেট বলতে আমার মতে তার যে পানি রাখার পাত্র ছিল তা বুঝাচ্ছে, তাতে রেখে দিত।] হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিবেদন করেন,

হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্‌ তা'লা আপনার দোয়ায় কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কী চাও– আমি এজন্য দোয়া করি? আমরা নিবেদন করি, হ্যাঁ। তখন মহানবী (সা.) দুই হাত উঁচু করে দোয়া করেন। তখনো তিনি তাঁর হাত নীচে নামান নি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং বৃষ্টি শুরু হয়। লোকেরা নিজেদের কাছে বিদ্যমান সমস্ত পাত্রে পানি ভর্তি করে নেন। এরপর আমরা বিষয়টি যাচাই করে দেখি যে, সৈন্যবাহিনীর অবস্থানস্থলের বাইরে অন্য কোথাও বৃষ্টি হয় নি।

অনুরূপভাবে তাবুকের ঝরনায় পানি বৃদ্ধির নিদর্শনের উল্লেখও পাওয়া যায়। হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধের বছর বের হয়েছিলাম। তিনি (সা.) নামায জমা করতেন। তিনি যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে আদায় করতেন। একদিন তিনি নামায পড়তে কিছুটা বিলম্ব করেন। এরপর বাইরে আসেন এবং যোহর ও আসরের নামায জমা করে আদায় করেন। এরপর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং মাগরিব ও ইশার নামায জমা করে আদায় করেন। অতঃপর হুযূর (সা.) বলেন, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্‌ তোমরা তাবুকের ঝরনার কাছে পৌঁছাবে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পুরোপুরি উদয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেখানে পৌঁছবে না। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে-ই সেখানে পৌঁছাবে, আমি সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত এর পানি স্পর্শ করবে না। [সেখানে ঝরনা ছিল; তিনি (সা.) বলেন, যতক্ষণ আমি না আসব তোমরা সেই পানি একটুও সংগ্রহ করবে না।] বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা সেই ঝরনার কাছে পৌঁছালাম, কিন্তু আমাদের মাঝে দুই ব্যক্তি সেখানে পূর্বেই পৌঁছে যায় এবং ঝরনা থেকে কিছুটা পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তাদের দুইজনকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি এর পানি স্পর্শ করেছ? তারা উভয়ে বলেন, জি হ্যাঁ। এতে মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে ভর্ৎসনা করেন; যেমনটি আল্লাহ্‌ চেয়েছেন তাদেরকে বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকেরা তাদের অঞ্জলিতে করে সেই ঝরনা থেকে অল্প অল্প পানি নেয়। এভাবে একটি পাত্রে সামান্য পানি জমা হয়ে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) সেখানে নিজের দুহাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে নেন এবং সেই পানি ঝরনাধারায় ঢেলে দেন। ফলে সেই ঝরনা সবেগে প্রবাহিত হতে থাকে আর লোকেরা তৃপ্তির সাথে তৃষ্ণা নিবারণ করে নেয়। এরপর মহানবী (সা.) হযরত মু'আয (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মু'আয! তুমি যদি দীর্ঘায়ু লাভ করো তবে এই স্থানটিকে বাগানে সুশোভিত হতে দেখবে। মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী যুরকানী এই হাদীসের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, এটি ছিল অদৃশ্যের সংবাদ যা পূর্ণ হয়েছে। আর মহানবী (সা.) যে বিশেষভাবে হযরত মু'আয (রা.)-র কথা বলেন– এতেও অদৃশ্যের কোনো সংবাদই ছিল। কেননা ঐশী তকদীরের অধীনে হযরত মু'আয (রা.) সেই অঞ্চলে অর্থাৎ সিরিয়া অভিমুখে এসেছিলেন এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এতে বুঝা যায়, সম্ভবত ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.) জেনে গিয়েছিলেন, হযরত মু'আয এই স্থানটি দেখবেন আর সেই উপত্যকা বৃক্ষরাজি ও বাগানে সুশোভিত হয়ে যাবে। ইবনে ওয়াযাহ অর্থাৎ আবু আব্দুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ বিন ওয়াযাহ, যার জন্ম ১৯৯ হিজরী সনে আর মৃত্যু ২৮৭ হিজীর সনে, তিনি আন্দালুসিয়ার একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ছিলেন; তিনি বলেন, আমি এই ঝরনার আশেপাশের সমস্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। গাছগাছালির সবুজ শ্যামলিমা ও সতেজতা এমন ছিল যেন এই আবহ কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে এবং এভাবেই তিনি (সা.) ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর সীরাত অ্যাটলাসে তাবুকের এই ঝরনা সম্পর্কে বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাবুকের বিচার বিভাগের প্রধান শায়খ সালেহ বলেন, দুবছর পূর্ব পর্যন্ত পৌনে চৌদ্দশ বছর যাবৎ ঝরনাটি ধারাবহিকভাবে প্রবহমান ছিল। [তিনি যখন এই বিষয় বর্ণনা করেন, সে সময়কার কথা এটি;] পরবর্তীতে অপেক্ষাকৃত নীচু অঞ্চলে যখন নলকূপ স্থাপন করা হয় তখন সেই ঝরনার পানি নলকূপগুলোর দিকে সরে যায়। পানির প্রবাহ প্রায় ২৫টি নলকূপে বিভক্ত হবার পরে এই ঝরনাটি শুকিয়ে যায়। অতঃপর শায়খ সালেহ আমাদেরকে একটি নলকূপের দিকে নিয়ে যান যেখানে আমি লক্ষ করলাম, চার ইঞ্চি একটি পাইপ সংযুক্ত রয়েছে আর কোনো ধরনের মেশিনের সাহায্য ছাড়াই সেখান থেকে পানি সবেগে প্রবাহিত হচ্ছে। আমাদের জানানো হলো, অন্য নলকূপগুলোরও প্রায় একই অবস্থা। এটি মহানবী (সা.)-এর মু'জিযারই একটি বরকত– আজ তাবুকে এত প্রচুর পানি রয়েছে যে, মদীনা ও খায়বার ছাড়া অন্য কোথাও আমাদের এত পানি দেখার সুযোগ হয় নি। বরং প্রকৃত বিষয় হলো, তাবুকের পানি এ দুটি স্থানের চেয়েও পরিমাণে বেশি। এই পানিকে কাজে লাগিয়ে এখন তাবুকের সর্বত্র বাগান করা হচ্ছে আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী তাবুক একটি বাগানবহুল স্থান এবং প্রতিনিয়ত বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

তাবুকের যুদ্ধাভিযানে প্রহরার দায়িত্ব সম্পর্কেও লিখিত রয়েছে, তাবুকের যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.) বিশেষ নিরাপত্তার জন্য হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)-কে নিযুক্ত করেন। তিনি (রা.) তার সঙ্গীদের নিয়ে সেনাদলের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতেন। একদিন তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আমাদের পেছনে ভোর হওয়া পর্যন্ত তাকবীরের ধ্বনি শুনতে পাই। আপনি কি আমাদের মাঝে অন্য কাউকে সুরক্ষার জন্য টহল দেবার নির্দেশ দিয়েছেন? জবাবে তিনি (সা.) বলেন, আমি এমনটি করি নি। হয়ত কিছু মুসলমান স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালন করছে। তখন হযরত সিলকান বিন সালামা (রা.)– যিনি এ দায়িত্বে নিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালোবাসায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কাজ করছিলেন– তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আমার দশজন অশ্বারোহী মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে বের হই এবং পাহারারত লোকদের পাহারা দেই। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) দোয়া করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে পাহারারতদের যারা পাহারা দেয়– তাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। তোমরা যে-সব মানুষ বা পশুর নিরাপত্তা বিধান করেছ তাদের মাঝ থেকে প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণীর বদলে তোমরা এক একটি কীরাত পরিমাণ পুরস্কার পাবে। এক কীরাত প্রায় দুই গ্রামে ওজন হয় স্বর্ণ ইত্যাদির হিসাবে।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, তাবুকের অভিযানের সময় লোকেদের অবস্থা এমন ছিল যে, প্রতিটি বিরতির সময় কিছু লোক পেছনে পড়ে যেত। সাহাবীরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নিবেদন জানাতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আজ অমুক ব্যক্তি পেছনে রয়ে গেছে। তখন তিনি (সা.) বলতেন, তোমরা তার কথা বাদ দাও। তার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ থাকে, আল্লাহ্ তাকে তোমাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন; আর যদি অন্য কোনো বিষয় থাকে, তবে আল্লাহ্ তার কাছ থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন। ইত্যবসরে কেউ এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! হযরত আবু যার (রা.) পেছনে রয়ে গেছেন, তার উট দুর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। যদি তার মধ্যে কল্যাণ থাকে, আল্লাহ্ তাকে তোমাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন; আর যদি তা না হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে তার থেকে মুক্তি দেবেন। তার অবস্থা এমন ছিল যে, তার উট তাকে অনেক বিরক্ত করছিল, সেটির গতি

একেবারেই কমে যায় ও সেটি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তিনি উট থেকে নেমে যান এবং নিজের মালপত্র কোমরে বেঁধে নেন এবং হেঁটে হেঁটে মহানবী (সা.)-এর পেছনে চলতে থাকেন। কিছু দূর অগ্রসর হবার পর মহানবী (সা.) এক স্থানে বিরতি নেন। তখন মুসলমানদের একজন দূর থেকে দেখে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! একজন মানুষ একা একা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে। তিনি (সা.) বলেন, 'কুন আবা যাররিন' অর্থাৎ, সে যেন আবু যার হয়! তারপর লোকেরা ভালোভাবে তাকিয়ে দেখে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র কসম, এ তো আবু যারই! তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আবু যারের প্রতি রহম করুন! সে একাই পথ চলে এবং একাই মারা যাবে আর তাকে একাই ওঠানো হবে। মহানবী (সা.) হযরত আবু যারের বিষয়ে একা থাকার যে ভবিষ্যদ্‌বাণীটি করেন, তা হযরত উসমান (রা.)-র খিলাফতকালে হুবহু পূর্ণতা লাভ করেছিল, যখন হযরত আবু যার (রা.) সপরিবারে মদীনার বাইরে রাবাযা নামক স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। রাবাযা হলো মদীনা থেকে প্রায় তিন দিনের পথ, অর্থাৎ প্রায় ৯৬ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। সেখানে তার সঙ্গে কেবল তার স্ত্রী, সন্তান ও এক দাস ছিল। তখন ঐ স্থানে অন্য কোনো জনবসতি ছিল না। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তার স্ত্রী একাকীত্বের ফলে বিচলিত হয়ে পড়েন; কাফন ইত্যাদির ব্যবস্থাও ছিল না, যার ফলে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। তখন হযরত আবু যার (রা.) বলেন, কেঁদো না! আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি জনমানবহীন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে এবং মু'মিনদের এক দল তার জানাযায় উপস্থিত হবে। তিনি তার স্ত্রীকে আরো বলেন, মহানবী (সা.) একথা বলার সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সবাই এখন মৃত, আর তাদের কেউই জনমানবহীন মরুভূমিতে মারা যায় নি। শুধু আমিই সেই ব্যক্তি। তাই ভয় পেয়ো না। আমি যখন মারা যাব, আমার মৃতদেহ গোসল দিয়ে মদীনায় যাবার পথে শুইয়ে রেখো। তার স্ত্রী তেমনটিই করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, সেখান দিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) তার সঙ্গীদের নিয়ে যাচ্ছেন। তারা ইরাক থেকে উমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তারা যখন জানতে পারেন– এটি আবু যার (রা.)-র জানাযা, তখন তাদের চোখ অশ্রুসজল হয় এবং তারা কেঁদে কেঁদে বলেন, মহানবী (সা.) সত্য বলেছেন– আবু যার একাই পথ চলে, একাই মারা যাবে। এরপর তিনি সঙ্গীদের নিয়ে তার জানাযা পড়েন এবং তাকে সেখানেই দাফন করেন। অতঃপর নিজ সাথিদেরকে তাবুকের যুদ্ধের সময় আবু যার (রা.) সম্পর্কিত পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন, কীভাবে মহানবী (সা.)-এর কথা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল।

হযরত ওয়াসেলা বিন আসকা (রা.)-র সৈন্যবাহিনীর সাথে যুক্ত হবার ঘটনাও রয়েছে। তিনি তাবুক যুদ্ধাভিযানের কিছুদিন পূর্বে মদীনায় এসে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি মদীনায় অবস্থানকালেই রসূলে করীম (সা.) তাবুক যুদ্ধাভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত ওয়াসেলা বিন আসকা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (সা.) তাবুক যুদ্ধাভিযানের জন্য আহ্বান জানান। আমি আমার নিজ ঘরে ফেরত যাই; কিন্তু সেখান থেকে ফেরত এসে দেখি, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ পূর্বেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। তখন আমি শহরে উচ্চৈঃস্বরে বলতে শুরু করি, এমন কেউ কি আছে যে তার সাথে একজন ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে পারবে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে যা পাওয়া যাবে তা বিনিময়ে নিয়ে নেবে? তখন এক বৃদ্ধ আনসারী বলেন, ঠিক আছে, তাহলে আমি তার অংশ নিয়ে নেব এবং আমার সাথে আরোহণ করাবো ও আমার সাথে পানাহার করাবো। আমি বলি, এই শর্ত আমি মেনে নিচ্ছি; আমিই হচ্ছি সেই ব্যক্তি। তখন সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি বলে, তাহলে আল্লাহ্‌র ওপর

ভরসা করে যাত্রা করো। হযরত ওয়াসেলা (রা.) বলেন, আমি অনেক উত্তম সঙ্গীর সঙ্গে রওয়ানা হই, এমনকি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদও দান করেন। আমার অংশে কিছু দ্রুতগামী উষ্ট্রী আসে। আমি সেগুলোকে হাঁকিয়ে আমার সাথির নিকট নিয়ে আসি। তিনি বের হয়ে আসেন এবং নিজের উটের পিঠে উল্টো হয়ে বসেন ও বলেন, এগুলোকে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে চালাও; এরপর বলেন, এগুলোকে আমার দিকে মুখ করে চালাও। অতঃপর বলেন, আমার কাছে তোমার উষ্ট্রীগুলো অনেক উন্নতমানের মনে হচ্ছে। আমি বলি, এগুলো তো আপনার সম্পদ যা প্রদানের শর্তে আমি রাজি হয়েছিলাম। তিনি বলেন, হে ভাতিজা! এগুলো তোমার অংশ, তাই তোমার কাছেই রাখো। আমার উদ্দেশ্য তো এগুলোর অংশ নেওয়া ছিল না। যাহোক, এই বাহানায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে।

অনুরূপভাবে হযরত আবু খায়সামা (রা.)-র সৈন্যবাহিনীর সাথে যুক্ত হবার ঘটনাও রয়েছে। রসূলে করীম (সা.)-এর সেই কাফেলা থেকে পেছনে থেকে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজন সাহাবী হযরত আবু খায়সামা (রা.)-ও ছিলেন। জানা যায়, তিনি সে সময় মদীনায় ছিলেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তাবুক যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার কিছুদিন পর তিনি (রা.) প্রচণ্ড এক গরমের দিনে মদীনায় নিজ বাড়িতে ফেরত আসেন। তিনি দেখতে পান, তার উভয় স্ত্রীই বাগানে নিজ নিজ কুটিরে পানি ছিটিয়ে রেখেছে, তার জন্য ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা করে রেয়েছে এবং তার জন্য খাবারও প্রস্তুত করে রেখেছে। হযরত আবু খায়সামা যখন কুটিরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান এবং তার জন্য তার স্ত্রীরা যে-সব আয়োজন করেছেন সেগুলো দেখেন তখন বলে ওঠেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কড়া রোদে, প্রচণ্ড গরমে এবং লু হাওয়ার মধ্যে সফর করছেন আর আবু খায়সামা শীতল ছায়ায়, সুস্বাদু খাবার, সুন্দরী স্ত্রী এবং নিজ ধনসম্পদের মধ্যে অবস্থান করবে? এটি কোনোক্রমেই ন্যায়বিচার হতে পারে না! এরপর তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কারো কাছেই ততক্ষণ পর্যন্ত আসব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত না হই। সুতরাং তোমরা দুইজনই আমার জন্য সফরের সামগ্রী প্রস্তুত করো। অতএব তারা উভয়েই এমনটি করে। এরপর আবু খায়সামা উটের ওপর আরোহণ করেন এবং রসূলে করীম (সা.)-এর পেছনে রওয়ানা হন। আর একদিন দুপুরবেলা প্রচণ্ড গরম ও দাবদাহের মধ্যেই মহানবী (সা.) দূর মরুভূমি থেকে একজন আরোহীকে আসতে দেখেন। ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী, মহানবী (সা.) তাবুকে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, কুন আবা খায়সামা– সে যেন আবু খায়সামা হয়! যখন তিনি নিকটে আসেন তখন সাহাবীরা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্র কসম, সে তো আবু খায়সামা আনসারীই বটে! তিনি (রা.) তার উটকে বসিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন এবং সালাম নিবেদন করেন। রসূলে করীম (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আবু খায়সামা! তুমি কেন পেছনে থেকে গিয়েছিলে? তখন তিনি (রা.) রসূলে করীম (সা.)-কে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। এতে তিনি (সা.) তার মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন, ইতিহাসে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) যখন তাবুক অভিমুখে রওয়ানা হন তখন কিছু সাহাবী পেছনে রয়ে যান। তাদের একজন ছিলেন হযরত আবু খায়সামা (রা.)। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। পেছনে থেকে যাবার কোনো চিন্তা তার (রা.) মনে ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হবার জন্য যখন নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তিনি (রা.) বাড়িতে ছিলেন না।

ঘরে ফিরে এসে দেখেন, তার (রা.) স্ত্রী তার অপেক্ষায় বসে আছেন যেন তিনি কিছু বলতে চাচ্ছেন। তিনি (রা.) তার স্ত্রীর ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কি রওয়ানা হয়ে গেছেন? তার স্ত্রী বলেন, আগে বসুন। তিনি (রা.) তখন উত্তরে বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন, আর আমি ঘরে বসে আরাম করব? আবু খায়সামার পক্ষে তা করা অসম্ভব! তিনি (রা.) সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়া প্রস্তুত করেন এবং তাতে আরোহণ করে সেই পথ ধরে রওয়ানা হন [যে পথে মহানবী (সা.) গিয়েছিলেন]। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখানে ঘোড়ার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রথম বর্ণনায় বা কতক স্থানে উটের উল্লেখ আছে। হতে পারে, ভুলবশত ঘোড়ার উল্লেখ এসেছে; কিংবা হতে পারে, উভয় প্রকার রেওয়ায়েতই রয়েছে। যাহোক, বাহন ছিল, যাতে চড়ে তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন। তিনি সে পথে চলতে থাকেন যে পথ ধরে মহানবী (সা.) গিয়েছিলেন। অবশেষে দীর্ঘ ও কষ্টকর সফর শেষে বহু পথ পাড়ি দিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। যখন তিনি সৈন্যদলের নিকট পৌঁছান তখন কিছু সাহাবী দূর থেকে উড়ন্ত ধুলা দেখতে পেয়ে অনুমান করতে থাকেন, এটি কে আসছে? তখন মহানবী (সা.) বলেন, কুন আবা খায়সামা অর্থাৎ আবু খায়সামা যেন হয়! এই বাক্যের অর্থ এমনটি তো হতে পারে না যে, যে-ই আসুক না কেন– সে যেন আবু খায়সামা হয়ে যায়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, আগন্তুক যেন আবু খায়সামা হয়। 'কুন' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অপর এক স্থানে লেখেন; প্রথম উদ্ধৃতিটি তফসীরে কবীরের আয়াতের ব্যাখ্যা ছিল, এখানেও তফসীর থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) 'কুন' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন, স্মরণ রাখা দরকার, কুন শব্দটি আরবী ভাষায় কাউকে নির্দেশ দেবার জন্যও ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো কেবল ইচ্ছা প্রকাশের জন্যও ব্যবহার করা হয়। মহানবী (সা.) যখন সিরিয়া অভিমুখে সেনাভিযান পরিচালনা করেন তখন আবু খায়সামা (রা.) নামক একজন সাহাবী ছিলেন যার প্রতি মহানবী (সা.)-এর অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তিনি (সা.) তাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি (সা.) জানতেন, এই ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে পারেন না। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে শহর থেকে কিছু দূরে পৌঁছান এবং নিজ সাহাবীদের অবস্থার খোঁজ নেন তখন তিনি (সা.) আবু খায়সামা (রা.)-কে অনুপস্থিত পান। মহানবী (সা.) তখন খুবই ব্যথিত হয়ে বলেন, তার ব্যাপারে আমি এতটা সুধারণা পোষণ করতাম, অথচ সে এই জিহাদ থেকে পেছনে রয়ে গেল! তিনি (সা.) যখন চলতে আরম্ভ করেন তখন কেউ একজন মহানবী (সা.)-কে বলেন, হুযূর! কেউ একজন পেছন দিক থেকে আসছে। তিনি (সা.) সেদিকে তাকান এবং বলেন, 'কুন আবা খায়সামা'। যখন ধুলা সরে গিয়ে আগন্তুক নিকটবর্তী হলেন তখন সবাই দেখল, তিনি আবু খায়সামাই বটে। মহানবী (সা.) তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, তিনি এত দ্রুত তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। 'কুন আবা খায়সামা' কথার অর্থ এটি ছিল না যে, আসছিল অন্য কোনো ব্যক্তি, কিন্তু মহানবী (সা.) বলেছেন, সে যেন আবু খায়সামা হয়ে যায়। বরং 'কুন আবা খায়সামা' কথার অর্থ ছিল, আল্লাহ্ করুন যেন আগমনকারী আবু খায়সামাই হয়। আরবী ভাষার এটি একটি বাগ্‌ধারা, কখনো কখনো ইচ্ছা প্রকাশের জন্য 'কুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

যে আয়াতের তফসীর তিনি (রা.) করেছেন, তা আমি এখানে পড়ি নি। তবে 'কুন' শব্দের ব্যাখ্যা আমি করে দিলাম। বাকি অংশ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে। রাবওয়ার মসজিদে হামলার ঘটনায় যারা আহত হয়েছিলেন তাদের জন্য দোয়া করুন, যারা

গুরুতর আহত হয়েছেন তাদেরকে যেন আল্লাহ্ তা'লা নিজ নিরাপত্তায় রাখেন এবং তাদের দ্রুত পূর্ণ আরোগ্য দান করেন, পাকিস্তানে বিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ও বিফল করুন। আজও রাবওয়াতে খতমে নবুওয়তের নামে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং মৌলবীরা যে-সব নোংরা ও অশালীন কথা বলার তা বলছে। বলে সেরেছে হয়ত, এতক্ষণে তাদের জলসা শেষ হয়ে যাবার কথা। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অনিষ্ট থেকে সকলকে নিরাপদ রাখুন।

একইভাবে বাংলাদেশের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। সেখানেও বিরোধীদের বড়ো ধরনের দুরভিসন্ধি রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সেখানেও সকল আহমদীকে সুরক্ষা করুন। ফিলিস্তিনীদের জন্যও দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি রহম করুন এবং অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদের মুক্তি দান করুন। যে যুদ্ধবিরতির কথা বলা হয়– তা তো কেবল নামসর্বস্ব। গত দুই দিনে যে-সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে– এটি নামসর্বস্ব যুদ্ধবিরতি ছিল। আল্লাহ্ তা'লা এসব নিপীড়িত মানুষদেরকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন এবং অত্যাচারীদের ধৃত করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)